Vol. 42 | No. 1 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের চিঠিপত্র প্রসঙ্গ

Volume	42
Issue	1
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
Published online	October 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v42i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i1.2
Pages	40-63
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুলের চিঠিপত্র প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম*

নজরুলের সমগ্র রচনাবলী প্রথম সঙ্কলন ও সম্পাদনা করে আবদুল কাদির আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। নজরুলের গ্রন্থাকারে অগ্রথিত রচনাবলী সঙ্কলনেও তিনিই প্রথম উদ্যোগী হন। অপ্রকাশিত সেসব রচনা প্রথম তাঁর 'নজরুল রচনা-সম্ভার' (১৯৬৯) গ্রন্থে ও পরে তাঁর সম্পাদিত রচনাবলীতে স্থান পায়। লক্ষণীয় বিষয়, তাঁর সম্পাদিত রচনাবলীর নতুন সংস্করণে চার খণ্ডের মধ্যে শেষ দুই খণ্ডের প্রায় সবটাই নজরুলের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী।

নজরুল রচনাবলীতে আবদুল কাদির প্রথম নজরুলের চিঠিপত্র সঙ্কলন করেন। কর্মব্যস্ত নজরুল ইসলাম প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে চিঠি অবশ্যই লিখেছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এ-পর্যন্ত সংগৃহীত তাঁর পত্রাবলির সংখ্যা খুবই কম। নজরুল রচানাবলীর নতুন সংস্করণে আমরা তাঁর লেখা মাত্র তেষট্টিটি চিঠি পেয়েছি। দুঃখের বিষয় নজরুলের সঙ্গে যাঁরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁদের কাছ থেকেও মাত্র দুটি কি একটি চিঠি সংগৃহীত হয়েছে। হবীবল্লাহ বাহার-তনয়া অধ্যাপিকা সেলিনা বাহার জামান সম্প্রতি হবীবুল্লাহ্ বাহারকে লেখা দুটি নতুন চিঠি উদ্ধার করেছেন। চিঠি দুটি সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত 'নজরুল পাণ্ডুলিপি' (১৯৯৪) গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের অবহেলায়ই নজরুলের অনেক চিঠি কালের অতলে হারিয়ে গেছে।

চিঠিপত্রও অনেক সময় সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে থাকে এবং সে কারণেই পত্রসাহিত্য বলে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে। নজরুল রচিত পত্রসাহিত্যের সংখ্যা কম। তাঁর অধিকাংশ পত্রই ব্যক্তিগত পত্র। নজরুলের কথাসাহিত্যে পরোক্ষভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে প্রত্যক্ষভাবে তিনি কোন স্মৃতিকথা জাতীয় লেখা লেখেন নি যাতে আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু অজানা তথ্য জানবো। একমাত্র চিঠিপত্রেই নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু

প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার

পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া এর পাশাপাশি নজরুল রচিত পত্র-সাহিত্যে নজরুলের জবানিতে তাঁর জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কেও আমরা কিছু তথ্য জানতে পারি।

নজরুলের চিঠিপত্রে আর এক নজরুলকে খুঁজে পাব অথবা না-জানা নজরুলকে দেখতে পাব—এই আশা নিয়েই আমরা নজরুলের চিঠিপত্র বিশ্লেষণে এখানে সচেষ্ট হয়েছি।

নজরুলের লেখা প্রথম যে পত্রটি (তারিখ ১৯-৮-১৯১৯) সংগৃহীত হয়েছে, তা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক 'মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম. এ. বিএল'কে লেখা। পত্রের শুরু -'অদাব হাজার হাজার জানবেন। বাদ আরজ—' এবং তার শেষে স্বাক্ষর 'খাদেম নজরুল ইসলাম।' এ যেন একজন উর্দিপরা সৈনিকের কেতাদুরস্ত চিঠি।

এ চিঠিটি নজরুল করাচি ক্যান্টনমেন্ট থেকে লিখেছিলেন। তখন তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতাও বৎসরাধিক কাল অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু এ-সময়েই তিনি সৈনিক জীবনের কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। চিঠিতেই তিনি উল্লেখ করেছেন 'সৈনিকের বড্ড কষ্টের জীবন' এবং নিরবচ্ছিন্ন সময়ের বিশেষ অভাব। ইতোমধ্যে, কয়েকটি লেখা 'সওগাত' এবং 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র জন্য প্রেরিত হয়। 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' শীর্ষক লেখাটি সওগাত জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'ক্ষমা' নামে যে কবিতা তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার জন্য প্রেরণ করেন, তা 'মুক্তি' নামে সে পত্রিকার শ্রাবণ ১৩২৬ সংখ্যায় ছাপা হয়। নজরুলের আলোচ্য প্রথম পত্রে তিনি কবিতার নাম পরিবর্তন এবং তা প্রকাশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সে-সঙ্গে দুটি নতুন রচনাও, একটি 'সুদীর্ঘ কবিতা' এবং অপরটি 'প্রায় দীর্ঘ গল্প' 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র জন্য পাঠান।

নজরুলের এ পত্রে একজন উদীয়মান লেখকের আত্মপ্রকাশকালের আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছে। কোন সাময়িকপত্রের সম্পাদকের কাছে লেখা পাঠানোর পর উৎকণ্ঠা এবং মুদ্রিত পত্রিকা বহনকারী ডাক পিয়নের জন্য যে প্রতীক্ষা, তার অভিজ্ঞতা কমবেশি অনেক সাহিত্যিকের জীবনে পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য পত্রে বর্ণিত তিনটি লেখার মধ্যে একটি লেখা অর্থাৎ 'হেনা' গল্পটি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশের পর তাঁর 'ব্যথার দান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। অপর দুটি কবিতা 'মুক্তি' এবং 'চিঠি (গাথা)' নজরুল পরবর্তীকালে যথার্থ রসোত্তীর্ণ কবিতা বলে মনে করেননি, তাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত কবিতা দুটি

গ্রন্থাকারে প্রায় অপ্রকাশিত ছিল। 'চিঠি' কবিতাটি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি, তবে তা ১৩২৭ বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গনূর' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

এই চিঠিটি নজরুলের প্রথম যুগের গদ্যশৈলীর কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন কৌতুকপ্রিয়তা এবং অলঙ্করণ প্রবণতা। এছাড়া করাচির আন্তর্জাতিক পরিবেশেরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় নজরুলের চিঠিতে ব্যবহৃত কিছু ইংরেজি শব্দ প্রয়োগে।

নজরুলের মধ্যে যে ভাবিকালের একজন সাহিত্যিক-নজরুল ঘুমিয়ে আছেন সেই আত্মপ্রত্যয় তাঁর এ চিঠিতে সুস্পষ্ট। তিনি লিখেছেন—"আপনার এরূপ উৎসাহ বরাবর থাকলে আমি যে একটি মস্তজবর কবি ও লেখক হব, তা হাতে কলমে প্রমাণ করে দিব, এ একেবারে নির্ঘাৎ সত্যি কথা' এ বাক্যের 'কবি ও লেখক হব' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

নজরুলের চিঠিপত্রের মধ্যে সংকলিত ২য় এবং ৩য় পত্র দুটি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা হয়েছিল। প্রথম পত্রটি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা 'চলমান জীবন' (২য় পর্ব) থেকে সংগৃহীত। পত্রটি অংশ – বিশেষ মাত্র এবং তাতে সম্বোধন বা পত্র শেষের নামাংশ নেই। অনুমান করা যায়, সম্বোধনটি ছিল সাধারণ সৌজন্যমূলক। নজরুল ইসলাম করাচির সেনানিবাস থেকে হাফিজের একটি কবিতার ভাবানুবাদ 'আশায়' শিরোনামে 'সবুজপত্রে' প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সবুজপত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী কবিতাটি প্রকাশের জন্যে অনুমোদন না করায় উক্ত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তা 'প্রবাসী' পত্রিকার তৎকালীন সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশের জন্য দেন। লেখকের অনুমতি না নিয়েই অন্য পত্রিকায় কবিতাটি ছাপানোর জন্য সৌজন্য রক্ষার্থে পবিতা গঙ্গোপাধ্যায় স্বতোপ্রণোদিত হয়ে নজরুলকে একটি পত্র দেন। আলোচ্য পত্রটি সে পত্রেরই উত্তরে লেখা।

এ-পত্রটি একটি সুন্দর পত্র। একজন সাহিত্য সমালোচকের ন্যায় কবি নিজেই তাঁর কবিতার রসোপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন সুললিত ভাষায়। একটু দীর্ঘ হলেও পত্রের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

> আমি কবিতাটি লিখেছি, পারসিক কবি হাফেজের মধ্যে বাঙ্গলার সবুজ দূর্বা ও জুঁই ফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চূর্ণ কুন্তলের যে মৃদু গন্ধের সন্ধান

> আমি পেয়েছি, সে-সবইত খাঁটি বাঙ্গলার কথা, বাঙালী জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আনন্দ রসের পরিপূর্ণ সমারোহ। কতশত বছর আগের পারস্যের কবি, আর কোথায় আজকের সদ্য শিশির ভেজা সবুজ বাঙ্গলা। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের রুক্ষ পরিবেশে মৃত্যুসমারোহের মধ্যে বসে এই যে চিরন্তন প্রেমিক মনের সমভাব আমি চাক্ষুষ করলাম আমার ভাষায়, আমার আপন জন বাঙালীকে সেইকথা জানাবার আকুল আগ্রহই এই এক টুকরো কবিতা হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। জানি না জুঁই ফুলের মৃদুগন্ধ ও দুর্বার শ্যামলতা এর মধ্যে ফুটেছে কিনা। তবু বাঙালীর সচেতন মনে মানুষের ভাবজীবনের এই একাত্মবোধ যদি জাগাতে পারে তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

করাচির সেনাবিনাস থেকে স্বদেশে ফিরে নজরুল কলকাতায় যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তন্মধ্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম। কিছুদিনের মধ্যেই দুজনের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তা পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা দ্বিতীয় পত্রে সুস্পষ্ট। দেওঘর থেকে লেখা ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২০ তারিখের পত্রের শিরোনাম এবং পত্র শেষের নিজনাম লেখার অন্তরালে কবির কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষণীয়। সম্বোধনটি হচ্ছে 'ভো ভো লিভ মশিয়েঁ' এবং চিঠির শেষে লেখা 'তোর পীড়িত দধি-লুব্ধ মার্জার নজর্'। নজরুলের এই সংক্ষিপ্ততম নাম 'নজর্' তাঁর আর কোন পত্রে আমরা লক্ষ করিনি, সর্বনামও আপনি থেকে তুই এ রূপান্তরিত। এ পত্রের আরেকটি বিশিষ্টতা হচ্ছে পারিবারিক কুশলবার্তা বিনিময়। নজরুল এখানে লিখেছেন -'তোর বৌএর খবর কি? তাঁর সঙ্গে আমার চিঠির মারফতে আলাপ করিয়ে দিস্।' এমনকি টাকা-পয়সার আদান-প্রদানের কথাও এতে রয়েছে। নজরুলের জীবনে কখনো কখনো স্বচ্ছলতা ও স্বচ্ছন্দতা এলেও তাঁর সারা জীবনই কেটেছে আর্থিক টানাপোড়েনে। জীবনের প্রায় শুরুতে লেখা এ চিঠিতেও আমরা দেখি—নজরুল বলেছেন 'টাকা ফুরিয়ে গেছে' এবং সেই সঙ্গে আফজাল-উল হক অথবা আলী অকবার খানের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে পাঠানোর অনুরোধ।

নজরুল-রচনাবলীতে সংকলিত ৪র্থ পত্রটি লেখা হয়েছে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার কার্যনির্বাহী পরিচালক আফজাল-উল হককে। এটি ১৯২২ সালে ২৮শে মার্চ তারিখে লেখা। তখন 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার অবস্থা সঙ্কটজনক। প্রথম বর্ষের সংখ্যাগুলো বৈশাখ ১৩২৭ থেকে চৈত্র ১৩২৭ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশের পর দ্বিতীয়

বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩২৮ ভাদ্র মাসে এবং পৌষ মাসে পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের যথার্থ সূত্রপাত হয় এ পত্রিকায় এবং তাঁর রচিত অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা এতে আত্মপ্রকাশ করে।

নজরুল এ পত্রে আফজাল-উল হককে 'আপনি' সম্বোধন করলেও তাঁদের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল ; তাই নজরুল পত্র শুরু করেছেন 'ভাই ডাবজল'। পত্রের শুরুতেই নজরুলের জিজ্ঞাসা 'মোসলেম ভারত কি ডিগবাজি খেল নাকি?' আফজাল-উল হকের প্রকাশনালয় থেকে নজরুলের 'ব্যথার দান' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, এ-পত্রে তাই লক্ষ করি একজন প্রকাশকের কাছে একজন লেখকের সেই চিরন্তন প্রশ্ন 'ব্যথার দান কেমন কাটছে? কত কাট্‌ল?' নজরুল যে কয়েক জনের কাছে নিজের অভাব অনটনের কথা বলতে পারতেন বা টাকা চাইতে পারতেন তাঁদের মধ্যে আফজাল-উল হক্ একজন। তাই এ চিঠিতে আমরা লক্ষ করি নজরুলের উক্তি — "আমার আজই কুড়ি টাকা টেলিগ্রাফ মনি অর্ডার করে পাঠাবেন kindly। বড্ড বিপদে পড়েছি। ... টাকা চাই-ই-চাই, ভাই।'

৫ম ও ৬ষ্ঠ পত্রটি মাহফুজুর রহমান খানকে লেখা। ৫ম পত্রের তারিখ ১৬ই জুলাই ১৯২৫। মাহফুজুর রহমান তখন কুড়িগ্রাম হাইস্কুলের ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। নজরুল ১৯২৪ সালে এই স্কুলের মিলাদ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন এবং কুড়িগ্রাম আসেন (মাহফুজুর ১৯৭০ : ৯৯-১০১)। এই সূত্রেই কবির সঙ্গে মাহফুজুর রহমানের পরিচয় ঘটে। ষষ্ঠ পত্রটি ২০শে জুলাই ১৯২৫ সালে লেখা এবং মাহফুজুর রহমান তখন কারমাইকেল কলেজের ছাত্র। এ দুটি পত্রে আমরা দুটি তথ্য জানতে পারি। একটি হচ্ছে বিভিন্ন সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বিদ্বজ্জনের সঙ্গে নজরুলের যেমন প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তেমনি স্কুল কলেজের ছাত্র ও তরুণ যুবকদের সঙ্গেও নজরুলের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাই এ পত্রে তিনি কয়েকজন তরুণ ছাত্রের কুশলাদি জানতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় তথ্যটি হল ১৯২৫ সালে নজরুলের 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু এ দুটি গ্রন্থের সমস্ত কপি সরকার জব্দ করতে পারেনি। কবি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের এই তরুণ ছাত্রদের মাধ্যমে সে বইগুলো গোপনে বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন। আলোচ্য দুটি পত্রে বইয়ের নাম উল্লেখ না করেই লিখেছেন –' বইয়ের টাকা আদায় হয়ে থাকলে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিবে। বই বিক্রি না হলে ফেরৎ পাঠাবে।' অথবা 'কতকগুলি বই ছিল ওদের কাছে তার কি হলো?'

মাহফুজুর রহমানকে লেখা আরেকটি পত্র রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (২৯ সংখ্য)। এটি ১২ই নভেম্বর ১৯২৭ তারিখে লেখা এবং মাহফুজুর রহমান তখন করটিয়া কলেজের ছাত্র। ইব্রাহীম খাঁ তখন ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ তৎকালীন বাংলার মুসলমান সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও বেদনার কথা উল্লেখ করে ১৯২৫ সালে একটি সুদীর্ঘ পত্র নজরুলকে প্রেরণ করেন। নজরুল সে পত্রের উত্তর যথাসময়ে দিতে পারেননি। পত্রটি ১৩৪৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'নওরোজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুলের সঙ্গে মাহফুজুর রহমানের পরিচয়ের কথা শুনে ইব্রাহীম খাঁ সে পত্রের বিষয়ে নজরুলকে একটি চিঠি লেখার জন্য মাহফুজুর রহমানকে নির্দেশ দেন। (মাহফুজুর ১৯৬৫ : ৬৬)। অধ্যক্ষের নির্দেশ মত নজরুলকে যে পত্র প্রেরণ করা হয় তার উত্তর চারদিন পরেই ১৬ নভেম্বর ১৯২৭ তারিখে মাহফুজুর রহমানের হস্তগত হয়। আলোচ্য পত্রে নজরুল জানান যে অধ্যক্ষ সাহেবের পত্রোত্তরে কবির একটি খোলা চিঠি 'মাসিক সওগাতে'র ১৩৩৪ এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। মাহফুজুর রহমান তাঁর পত্রে 'নওরোজ' পত্রিকা কেন বন্ধ হয়ে গেল সে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন। ১৯২৭ সালের বৈশাখ মাসে 'নওরোজ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং তা পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী ছিলেন বে-নজির আহমদ। পত্রিকাটি কেন বন্ধ হল সে সম্পর্কে নজরুল তাঁর পত্রে উল্লেখ না করে তিনি জানান যে 'ওর সম্পর্কে থাকা আমার আর নিরাপদ নয় ভেবেই ওর থেকে সম্বন্ধ ছিন্ন করেছি।' এর প্রকৃত কারণ হল বে-নজির আহমদ তখন রাজরোষে পড়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। নজরুল তখন সংসারী মানুষ, পুত্রসন্তান বুলবুলের পিতা। সুতরাং তিনি ইচ্ছে করেই নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া অভাবের তাড়নায়ও তিনি ক্ষুব্ধ। ক্ষোভের সঙ্গেই তাই তিনি এ চিটিতে লিখেছিলেন— "এক এক সময় নিবিড় বেদনার সঙ্গে অনুভব করি যে, কত বিরাট সম্ভাবনার আশা আমার অভাবের আওতায় খর্ব হয়ে গেল।" এরই সঙ্গে কবি আরেকটি বেদনার কথা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে তৎকালীন সমাজের কাছ থেকে তিনি কিভাবে নিন্দিত ও অবহেলিত হয়েছেন। তিনি লিখেছেন —'দুঃখ হয়, এদেশে কেন জন্মালাম—এই নিন্দুকের হিংসুকের দেশে।" প্রকৃতপক্ষে মাহফুজুর রহমানকে লেখা এই বেদনার কথা প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খানের কাছে লেখার পত্রেরই প্রতিধ্বনি। সে পত্রটি নজরুল রচনাবলীতে ৩০ সংখ্যক পত্ররূপে সংকলিত।

৭ম পত্রটি (৩১ শে শ্রাবণ ১৩৩২) বর্ধমানের 'শক্তি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবলাই দেবশর্মাকে লেখা। 'শক্তি' পত্রিকা প্রকাশের জন্য সম্পাদককে তিনি অভিনন্দন জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন—"ধূমকেতু'তে চড়ে আমার আর একবার বাঙলার পিলে চম্‌কে দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু গোবরমণ্ড (সকার) সাহেব পেছনে ভীষণ লেগেছে। কোন ক্রমেই একে উঠতে দেবে না।" এখানে 'গবর্নমেন্ট' শব্দটি নজরুল ব্যঙ্গ করে লিখেছেন 'গোবরমণ্ড'। রঙ্গরস বা ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে কবি এরকম অনেক শব্দকেই দুমড়ে মুচড়ে নতুন শব্দে রূপান্তরিত করেছেন। এ জাতীয় রূপান্তরিত শব্দের প্রচুর উদাহরণ তাঁর 'চন্দ্রবিন্দু' কাব্যে এবং কমিক গানে ও অন্যান্য রচনায় পাওয়া যাবে। এ-পত্রে নজরুল সম্পাদককে সতর্ক করে দিয়েছেন—"লাভ লোভকে এড়িয়ে চলার অসম সাহসিকতা নিয়ে তবে এতে নামতে হবে।" এ জাতীয় উক্তি তাৎপর্যময়। পত্রপত্রিকা সম্পাদনা কালে নজরুলও লাভ ও লোকসানের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল স্বদেশ-প্রেম।

রচনাবলীতে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদকে লেখা দুটি পত্র (১৩ ও ৪১ সংখ্যক) এবং হবীবুল্লাহ বাহারকে লেখা একটি সংক্ষিপ্ত পত্র (৪৩ সংখ্যক) সংকলিত হয়েছে। সম্প্রতি হবীবুল্লাহ বাহারকে লেখা দুটি পত্র সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত 'নজরুল পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থে, (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ দুটি পত্র রচনাবলীতে নেই। প্রথম পত্রটি ১৯২৫ সালের ৬ই অক্টোবর তারিখে হুগলি থেকে লেখা এবং দ্বিতীয় পত্রটি লেখা হয় কলকাতা থেকে ১৯২৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। নজরুলের সঙ্গে হবীবুল্লাহ বাহার লিখেছেন—"প্রথম দেখাতেই তিনি হেসে উঠলেন, যেন যুগ যুগের চেনা। উপস্থিত কেউ বুঝতেও পারল না, সেই আমাদের প্রথম পরিচয়"। (সেলিনা ১৯৯৪ : ২১)। প্রথম পরিচয়ের পর থেকে নজরুলের সঙ্গে হবীবুল্লাহ বাহারের সাক্ষাৎ বা পত্রালাপ অব্যাহত ছিল। হবীবুল্লাহ বাহার বা শামসুন্নাহারকে লেখা অন্যান্য পত্রের ন্যায় হুগলি থেকে লেখা এ পত্রেও শেষে লেখা ছিল 'নূরুদা'। নজরুল তাঁর একান্ত পারিবারিক ডাকনামে ডাকার অধিকার মুষ্টিমেয় যে কয়েক জনকে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এই ভ্রাতা-ভগিনী অন্যতম। নজরুল যে এই বাহার-নাহার পরিবারের কতটা আপনজন ছিলেন, তা এই 'নূরুদা' কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে।

হুগলি থেকে লেখা এ চিঠির শেষাংশে রয়েছে নজরুলের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে কিছু তথ্য। তিনি লিখেছেন —

> আমার শারদীয় সংখ্যা 'বিজলীর' কবিতাটি (আমার কৈফিয়ত) পড়নি কি? পড়ো ওটা যোগাড় করে। আমার নতুন কবিতার বই 'ছায়ানট' বেরিয়েছে, দিন পনের হলো। বোধহয় দেখনি। আমি আপাতত আটখানা 'ছায়ানট' ও দশখানা করে 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' পাঠিয়ে দেব তোমায় কালকের মধ্যে। 'অগ্নিবীণা' তৃতীয় সংস্করণ মাসখানেক হলো বেরিয়েছে তা কলকাতা থেকে আনিয়ে পাঠিয়ে দেব শিগগির। (সেলিনা ১৯৯৪ : ১৪৭)।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'আমার কৈফিয়ত' 'বিজলী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪১ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯২৫) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'ছায়ানট' গ্রন্থের প্রকাশকাল ২২-৯-২৫। নজরুল ইসলাম তাঁর নিষিদ্ধ গ্রন্থ 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' যে গোপনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সে তথ্য মাহফুজুর রহমান খানকে লেখা পত্রে আমরা পেয়েছি। নজরুল জীবনীকার মুজাফ্‌ফর আহমদও এ বিষয়ে লিখেছেন—"দুর্দিনে এই পুস্তক দু'খানা হতে নজরুলের পরিবারের অনেক সাহায্য হয়েছে।" (মুজফ্‌ফর ১৯৬৯ : ৩৩৬)।

পরের বছর ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে বাহারের আমন্ত্রণে নজরুল চট্টগ্রামে যান এবং তিনি বেশ কিছুদিন বাহারের মাতামহ খান বাহাদুর আবদুল আজিজের তামাকুমুণ্ডির বাড়িতে অবস্থান করেন। ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে পুনরায় তিনি চট্টগ্রাম যান এবং সেই বাড়িতে কিছুদিন থাকেন। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন —

> যে কয়দিন তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে, মনে হতো বাড়িখানি যেন ভেঙ্গে পড়বে। রাত্রি দশটায় থারমোফ্লাস্ক ভরে চা, বাটা ভরা পান, কালিভরা ফাউন্টেন পেন আর মোটামোটা খাতা নিয়ে তাঁর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতাম। সকালে উঠে দেখতাম, খাতা ভর্তি কবিতায়। (সেলিনা ১৯৯৪ : ১৬১)।

নজরুল দু'বারই দুটি খাতায় অনেক কবিতা লেখেন। অনেক বিখ্যাত কবিতা এ সময়ে লেখা হয়েছিল— 'সিন্ধু (৪ তরঙ্গ)' 'অনামিকা', 'গোপন প্রিয়া', 'কর্ণফুলী', 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি', 'স্তব্ধরাতে', 'বাদলরাতের পাখি'।

নজরুলের পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নতুন আরেকটি চিঠিও হবীবুল্লাহ্ বাহারকে লেখা (১৯২৯, ৮ ফেব্রুয়ারি)। নজরুলের উপস্থিতিতে হাসি, গান ও

চিৎকারে তামাকুম্মুণ্ডির সে বাড়িটি কী রকম মুখর ছিল, তার পরিচয় এ চিঠিতেও রয়েছে—

> তোমাদের বাড়ির টিনগুলো ফুটো হয়ে গেছে কিনা আমাদের চিৎকারে, পরখ করে দেখে আসতে ভুলে গেছি। তোমাদের বোধহয় এ বৎসর আবার মিস্ত্রি লাগাতে হবে। (সেলিনা ১৯৯৪ :১৫৭)।

১৯৩০ ২০শে ডিসেম্বর হবীবুল্লাহ্ বাহারকে লেখা পত্রে (রচনাবলীর ৪৩ সংখ্যক) নজরুল লিখেছেন - 'তোমার কাছে 'সাতভাই চম্পার' যে কবিতাগুলি ছিল-শ্রীমান কাদিরকে তা দিও।' নজরুল রচিত এ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। তবে 'পুতুলের বিয়ে' (১৩৪০) গ্রন্থে চার ভাইয়ের জবানিতে চারটি কবিতা রয়েছে — 'আমি হব সকাল বেলার পাখি', 'আমি হব গাঁয়ের রাখাল ছেলে', 'আমি হব দিনের সহচর', এবং 'আমি সাগরপাড়ি দেব আমি সওদাগর।'

নজরুল রচনাবলীতে সংকলিত ১৩ সংখ্যক পত্র ১৯২৬ ১১ আগস্ট তারিখে বেগম শামসুননাহার মাহমুদকে লেখা। পত্রের শেষে নাম রয়েছে 'নূরুদা'। নজরুল ইসলামের লেখা সুদীর্ঘ এ পত্রটি যেন কবিরই আত্মপরিচিতি অথবা আত্ম প্রতিকৃতি। যথার্থ পত্র-সাহিত্য বিবেচনায় পত্রটি ১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বুলবুল' পত্রিকায় 'চিঠি' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়। পাদটীকায় লেখা হয়েছিল : "চিঠিখানি কবি নজরুল ইসলাম তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা কোন বালিকাকে কয়েক বৎসর আগে লিখেছিলে।" এ-পত্রে নজরুল রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতার উল্লেখ করে রবীন্দ্র-মানসের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। সুকৌশল উপমা-রূপক প্রয়োগে এবং অপূর্ব বাকচাতুর্যে পত্রটি একটি অনিন্দ্য-সুন্দর পত্র। এ-পত্রের অনেক বাক্যই আপ্তবাক্যে পরিণত হয়েছে যেমন 'কবি চায়না দান, কবি চায় অঞ্জলি, কবি চায় প্রীতি, কবি চায় পূজা' ; 'কবিকে হয়তো সম্মান করা যায় না- কাব্যকে সম্মান করা যায়।'

নজরুল চট্টগ্রাম সফরে বেশ কিছু ফটো তুলেছিলেন এবং সেগুলি সংগ্রহের জন্যে তিনি আলোচ্য পত্রে বেগম শামসুননাহারকে অনুরোধ জানান—

> আমার পাহাড়ে ও ঝর্ণাতলে তোলা ফটো একখানা করে পাটিয়ে দিও। গ্রুপের ফটো একখানা (যাতে হেমন্তবাবু ও ছেলেরা আছে), আমি, বাহার ও অন্যকে একটি ছেলেকে নিয়ে তোলা যে ফটো তার একখানা এবং আমি ও বাহার দাঁড়িয়ে তোলা ফটোর একখানা—পাঠিয়ে দিও আমায়।

ফটো সংগ্রহের ব্যাপারে নজরুলের এই আগ্রহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে লক্ষ করা যায়, কবি কোথায়, কখন এবং কার কার সঙ্গে ছবি তুলছেন তা তিনি ভোলেন নি।

১৯২৯ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি শামসুননাহার মাহমুদকে লেখা পত্রটি (৪১ সংখ্যক) চট্টগ্রাম সফর শেষে কোলকাতা থেকে লেখা। চট্টগ্রামের স্মৃতি কবিকে কিভাবে বিমোহিত করেছিল তার পরিচয় এ-চিঠিতে ধরা পড়েছে। কবি লিখেছেন—

> আমার বন্ধু সিন্ধু, কর্ণফুলীর খবর তো তুমি দিতে পারবে না, তবে 'গুবাক তরুর সারি'র খবর নিশ্চয় দিতে পারবে। ওরা যেন কত শুকিয়ে গেছে, ওদের আঁখি পল্লবে হয়তো আজকাল একটু অতিরিক্ত শিশির ঝরে, বাতাসে হয়তো একটু বেশি করে শ্বাস ফেলে।

মাসিক 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুকে লেখা ৪টি পত্র রচনাবলীতে সংকলিত হয়েছে। প্রথম পত্রটি দিন ছয়েক ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠে ১৯২৫ সালের ২৫শে নভেম্বর তারিখে লেখা। রসিকতা করে কবি লিখেছেন —'পঞ্চাশ গ্রেন কুইনাইন মস্তিষ্কে উনপঞ্চাশ বায়ুর ভিড় জমিয়েছে' আর তাই কবির মাথাটিও হয়ে উঠেছে 'দশমুণ্ড রাবণের মত ভারী।' বিদ্রোহী হবার সুপ্ত বাসনা কবির মধ্যে তখনও জাগ্রত। তাই তিনি এ পত্রে বলছেন—

> আমরা কুম্ভকর্ণ হতে পারি, বিভীষণ হতে পারি – হতে পারি নি শুধু রাবণ। দেবতা হবার লোভ আমার কোনও দিনই নেই—আমি হতে চাই তাজা রক্ত মাংসের শক্ত হাড়ডিওয়ালা দানব-অসুর।

এই চিঠিতে নজরুলের সম্পাদনায় আশু প্রকাশ্য 'লাঙল' পত্রিকার কথা উল্লেখ করা হয়। প্রথম সংখ্যায় নজরুলের 'কৃষাণের কথা' কবিতা ছাপা হবে বলে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা দ্বিতীয় সংখ্যায় (১-১-১৯২৬) ছাপা হয়। প্রথম সংখ্যায় (সম্ভবত ২৪শে বা ২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৫) সাম্যবাদী নামের কবিতাগুচ্ছ মুদ্রিত হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে নজরুল এই চিঠিতে তাঁর একটি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন যে, 'লাঙল' অফিসের প্রধান দরজায় আস্ত একটি লাঙল ঝুলিয়ে দেয়া হবে। নজরুল যদিও এই পত্রে মুরলীধরকে অনুরোধ করেন যেন তিনি 'লাঙল' পত্রিকার জন্য শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করেন কিন্তু এঁদের কারো লেখা 'লাঙল' পত্রিকায় প্রকাশিত ১৬টি সংখ্যায় লক্ষ্য করা যায় নি।

মুরলীধর বসুকে লেখা নজরুলের দ্বিতীয় পত্রে (রচনাবলী ১৬ সংখ্যক) পারিবারিক একটি সুসংবাদ পরিবেশন করা হয়, তা হচ্ছে নজরুলের পুত্র সন্তান লাভ। যেদিন নজরুলের পুত্র বুলবুল-এর জন্ম হয়, সেদিনই তিনি এ সুসংবাদ জানিয়ে মুরলীধর বসুকে, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে এবং ব্রজবিহারী বর্মণকে সংক্ষিপ্ত পত্র লেখেন। গবেষকগণ মনে করেন, তিনটি পত্রেই তারিখে ৯ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ভুলক্রমে ৯ই অক্টোবর লেখা হয়। (রফিকুল ১৯৯৭ : ১১৫)। নজরুল এ-পুত্র সন্তান লাভে যে বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন তা তাঁর এ চিঠিগুলোতে সুস্পষ্ট। বুলবুল যে নজরুলের কতখানি প্রিয় ছিল তা বুলবুলের অকাল মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'রুবাইয়াত-ই-হাফিজ' (১৯৩০), কাব্যের উৎসর্গ পত্রে আমরা লক্ষ্য করি। এ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন —

> যেদিন অনুবাদ শেষ হল, সেদিন আমার খোকা বুলবুল চলে গেছে। আমার জীবনের যে ছিল প্রিয়তম যা ছিল শ্রেয়তম তারই নজরানা দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাঙলায় আমন্ত্রণ করে আনলাম।

'প্রায় মাসখানেক ধরে জ্বরে ভুগে' উঠে নজরুল ২৬-১২-১৯২৬ তারিখে মুরলীধরকে একটি পত্র লেখেন, এ সময় তিনি শারীরিক দুর্বলতা ছাড়াও 'নিত্য অভাবের চিত্তক্ষোভে' আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অর্থের জন্যই তিনি 'শুয়ে শুয়ে' কয়েকটি গান লেখেন যার কয়েকটি 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠান আর দুটি গান মুরলীধরকে পাঠিয়ে অনুরোধ করেন—

> দুটো তোমার কাছে পাঠাচ্ছি —'বঙ্গবাণীতে' দিয়ে আমায় তাড়াতাড়ি কিছু নিয়ে দেবার জন্য। অন্য সব জায়গায় দশ টাকা করে দেয় আমায় প্রত্যেকটা কবিতার জন্য, একথা ওদের বলো। গান দুটি পেয়েই যদি ওরা টাকাটা দেয় তাহলে আমার খুব উপকার লাগে।— আমাদের আর মান-ইজ্জত রইল না, মুরলীদা,—না, অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্বটাকেও কেড়ে নেয় শেষে !

কবি জীবনের একটি বেদনাায়ক চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে, একটি কবিতা লিখে পত্রিকা থেকে দশ টাকাও পাবেন কিনা সে বিষয়ে যেমন সংশয় রয়েছে, তেমনি আরও বড় সংশয় তাঁর মনে জেগেছে অর্থাভাবে মান-ইজ্জত না হারাতে হয়।

রচনাবলীর ২১ সংখ্যক পত্রটি ২-১-২৭ তারিখে মুরলীধর বসুকে লেখা। মানুষের

জীবনে মাঝে মাঝে এমন অবস্থারও সৃষ্টি হয় যখন সে নিজেকে ভাবে জীবনযুদ্ধে পরাজিত। মুরলীধরকে লেখা এ পত্রে এমনি দুজন সাহিত্যিকের হতোদ্যম অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। নজরুল লিখেছেন —

> আজ সকালে শৈলজার চিঠি পেয়েছি - চিঠি ত নয়, বুক চাপা কান্না। দুই বাল্যবন্ধু যৌবনের মাঝ দরিয়ায় এসে পরস্পরের ভরাডুবি দেখছি। কারুর কিছু করবার শক্তি নেই। ... যত ভাঙ্গা তরীর ভিড় - এক জায়গায় !

আন্ওয়ার হোসেনকে লেখা দুটি পত্র (রচনাবলীতে ৯ ও ১১ সংখ্যক) বিশেষ তাৎপর্যময়। এখানে আন্ওয়ার হোসেনের লেখা পত্রের উত্তর কবি কাব্যচর্চার উদ্দেশ্য এবং কবির ধর্ম সম্পর্কে কিছু উক্তি করেছেন যা পরোক্ষভাবে তৎকালীন খড়গ -হস্ত মুসলমান সমাজের উদ্দেশ্যে লেখা। ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩৩২ তারিখে লেখা এ পত্রে তিনি লিখেছেন —

> মুসলমান সমাজ কেবলই ভুল করেছে—আমার কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিত্বকে অর্থাৎ নজরুল ইসলামকে জড়িয়ে। আমি মুসলমান - কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু কবি, মুসলমান কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এত ভুলের সৃষ্টি !

এ পত্রেরই অন্যত্র তিনি লিখেছেন একটি চিরন্তন আপ্ত বাক্য—"ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না, জন্মও লাভ করতে পারে না।"

আন্ওয়ার হোসেনকে লেখা দ্বিতীয় পত্রের তারিখ ১লা মার্চ ১৯২৬। কিছুদিন আগে নজরুলের 'সাম্যবাদী' (ডিসেম্বর ১৯২৫) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নজরুলের মতে, এই 'সাম্যবাদী' প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবির 'সুরের পরবর্তন হয়েছে', কবির মতে সাম্যবাদীর সুর 'নবীনতর সুর'। কবির হাতের বাঁশী 'সত্যের হাতের বাঁশী।' এ পত্রের একটি বাক্যে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কবির অর্জিত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়– "কোরানে ৯৯৯ জায়গায় জেহাদের কথা এবং ৩৩ জায়গায় সালাতের বা নামাজের কথা বলা হয়েছে।"

নজরুল তাঁর পুত্রসন্তান লাভের সংবাদ জানিয়ে বর্মণ পাবিলিশিং হাউসের ব্রজবিহারী বর্মণকে (৯-১০-১৯২৬ তারিখ) যে পত্র (রচনাবলীর ১৫ সংখ্যক) দিয়েছেলেন, তাতে তিনি উল্লেখ করেন - "সঞ্চিতার প্রুফ পেলাম—'সর্বহারা'র শেষ প্রুফ কই?"

নজরুলের গ্রন্থ প্রকাশে যে কয়েকজন প্রকাশক উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বর্মণ পাবলিশিং হাউস অন্যতম। এই প্রকাশনালয় থেকে ১৯২৫ সালে কবির 'ছায়ানট' প্রকাশিত হয়। নজরুলের এ-চিঠি লেখার দিন পনেরো মধ্যেই বর্মণ পাবিলিশিং হাউস থেকে সর্বহারা কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় এর প্রকাশকাল ২৫শে অক্টোবর ১৯২৬, সুতরাং নজরুল এ গ্রন্থের শেষ প্রুফ দেখেছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।

নজরুলের কবিতা-সঞ্চয়ন 'সঞ্চিতা' ১৯২৮ সাল থেকে অদ্যাবধি 'ডি, এম, লাইব্রেরী' প্রকাশ করে যাচ্ছে। ১৯২৮ সালে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে, 'সঞ্চিতা'র আর একটি সংস্করণ বর্মণ পাবলিশিং হাউস প্রকাশ করে। এর প্রায় দু'বছর আগে লেখা পত্রে ব্রজবিহারী বর্মণকে লেখা পত্রে জানা যায় যে, কবি তখন 'সঞ্চিতা'র প্রুফ দেখছেন। নজরুলের 'সঞ্চিতা' যে দু'জন প্রকাশকের হাতে প্রায় একই সময়ে, দুটি পৃথক সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হয়—এ তথ্য বেঙ্গল লাইব্রেরী তালিকা থেকে বর্তমান প্রবন্ধকার প্রথম উদ্ধার করেন এবং তা ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সৈয়দ আলী আহসান রচিত 'নজরুল ইসলাম' গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হয়।

বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকা - অনুসারে 'সঞ্চিতা' প্রথম বর্মণ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং এর প্রকাশকাল ২রা অক্টোবর, ১৯২৮, পৃস্ঠা সংখ্যা ২+ ১৩০, মূল্য দেড় টাকা। এতে কবিতাসমূহ 'অগ্নি-বীণা', 'ঝিঙেফুল', 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা', 'ছায়ানট', 'দোলন-চাঁপা', 'সিন্ধু-হিল্লোল' এবং 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'সঞ্চিতা'র ডি, এম লাইব্রেরীর সংস্করণও ১৯২৮ সালের ১৪ই অক্টোবরে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩+২২৩ এবং মূল্য আড়াই টাকা। এতে স্থান পায় 'অগ্নি-বীণা', 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা', 'সিন্ধু-হিল্লোল', 'চিত্তনামা', 'ঝিঙে ফুল' 'বুলবুল', ও 'জিঞ্জীর' কাব্যের কবিতাসমূহ।

রচনাবলীর আঠারো সংখ্যক পত্রটি ব্রজবিহারী বর্মণকে ১৯২৬-এর ২০শে ডিসেম্বর তারিখে লেখা। কবি তখন কৃষ্ণনগরে এবং প্রায় শয্যাগত। পত্রের শুরুতেই তিনি লিখেছেন — "বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি রোগের ও অন্যান্য চিন্তার জ্বালায়। চিন্তার মধ্যে অর্থ-চিন্তাটাই সবচেয়ে বড়।" ব্রজবিহারীর কাছে তিনি পঁচিশ টাকা চেয়েছিলেন, কিন্তু তার বদলে তিনি মাত্র পনের টাকা পান। তাই, এ পত্রে তিনি অনুরোধ করেন—

"আরও যদি পাঠাতে পার আমার এই দুর্দিনে, বড় উপকৃত হব।"

রচনাবলীর পরবর্তী পত্রটিও ব্রজবিহারী বর্মণকে লেখা। এটি তারিখ বিহীন। তবে, অনুমান করা যায়, নজরুল ১৯২৬-এর ডিসেম্বর মাসেই কোলকাতায় গিয়েছিলেন টাকার জন্য। কিন্তু জ্বরে শয্যাগত থাকায় তিনি কিছু করতে পারেননি। লোক মারফত প্রেরিত এ পত্রে তাই তিনি লিখেছেন- "ঘরে সব মরছে না খেয়ে, তাই এসেছিলাম টাকার যোগাড়ে- তুমি অন্ততঃ পঁচিশটি টাকা নিয়ে আসবে।"

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ১৯২৫-এর নভেম্বর মাসে নজরুল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পর ১৯২৬ এবং ১৯২৭-এর মধে লেখা তাঁর প্রায় পত্রে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি রোগাক্রান্ত বা জ্বরে শয্যাগত। ব্রজবিহারী বর্মণকে ২০-৪-১৯২৭ তারিখে লেখা পত্রেও তিনি জানাচ্ছেন—"প্রায় প্রত্যহ Slow fever আসিতেছে।" এ পত্রে (রচনাবলীর ২৭ সংখ্যক) তিনি লিখছেন ..'পত্রপাঠ মাত্রই অন্ততঃ কুড়িটি টাকা TMD করে পাঠাও... বাজার খরচের পর্যন্ত পয়সা নেই।"

আমাদের বিস্মিত হতে হয়, যখন দেখি নজরুল প্রকাশকদের কাছ থেকে প্রাপ্য সম্মানী না পেয়ে টাকার জন্য বারংবার কাতর মিনতি জানাচ্ছেন। এ শুধু কবির দুর্ভাগ্য নয়, জাতিরও দুর্ভাগ্য।

'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে নজরুলের দীর্ঘকালের সম্পর্ক। পত্রালাপ অবশ্যই ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনকে লেখা একটি মাত্র পত্র নজরুল রচনাবলীতে সংকলিত হয়েছে। সংকলিত পত্রটি ৩-১২-১৯২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর থেকে লেখা। নজরুলের মাতৃতুল্য মিসেস এম রহমানের পরলোক গমনের পর শোকার্ত নজরুল এ পত্রটি লেখেন। তিনি লিখেছেন—

> মার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমার সব গুলিয়ে গেল। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। আপন পেটের ছেলের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন মা আমায়। আমি তার প্রতিদানে কিছুই দিতে পারিনি। আমি আজ দেউলিয়া হয়ে যেন জীবনের জোয়ার ভাটা দেখছি শুধু। মন বড় খারাপ তাই এখন মার নামে যে কবিতাটি পাঠালাম—এটাই মাঘের সওগাতের প্রথমে দিয়ে দেবেন।

মিসেস এম রহমান ১৯২৬, ২০শে ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। নজরুল ১৩৩৩ এর ১৫ই পৌষ 'মিসেস এম রহমান' নামে যে সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন তা প্রকাশের জন্য তিনি মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের কাছে প্রেরণ করেন এবং ১৩৩৩-এর মাঘ

সংখ্যা 'সওগাতে'ই কবিতাটা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি পরে 'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মিসেস এম রহমানের পূর্ণনাম মাসুদা খাতুন (১২৯১-১৩৩৩)। তিনি হুগলি জজ কোর্টের উকিল খান বাহাদুর মৌলভী মাজহারুল আনোয়ার চৌধুরীর কন্যা এবং শ্রীরামপুরের তদানীন্তন সাব রেজিষ্ট্রার কাজী মাহমুদুর রহমান সাহেবের পত্নী ছিলেন। তিনি 'মা ও মেয়ে' নামে একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'চানাচুর' নামে একটি মরণোত্তর গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। 'চানাচুর' গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। 'চানাচুর' গ্রন্থের একটি বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়- এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন নজরুল ইসলাম।

হুগলিতে নজরুলের সঙ্গে প্রমীলার বিবাহের সময় মুসলমান এবং অমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল সমাজ এই বিবাহকে সমর্থন করতে পারেনি। সাদামাটা বিবাহ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিল এই মিসেস রহমানের স্নেহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম। নজরুল এই মাতৃসমা রমণীর নামে তাঁর 'বিষের বাঁশী' কাব্যটি উৎসর্গ করেন। উৎসর্গের শিরোনামে লেখা ছিল 'বাঙ্গলার অগ্নিনাগিনী মেয়ে মুসলিম মহিলা কুল-গৌরব আমার জগত জননী স্বরূপা মা মিসেস এম রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে।"

আলোচ্য পত্রে নজরুল মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের কাছেও টাকা চাইছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করেছেন — 'আপনি এটা ঋণ দিচ্ছেন মনে রে দেবেন।' অনুমান করা যায় 'সওগাত' পত্রিকায় লেখার জন্য নজরুলের কোন সম্মানী পাওনা ছিল না। কিন্তু অন্য প্রকাশকদের কাছে নজরুলের পাওনা ছিল যা তিনি পাননি। তিনি লিখছেন "অন্য পাবলিশারের কাছেও টাকা পাচ্ছিনে চিঠি লিখে ; লেখার দামও পাচ্ছিনে- যেখানে যেখানে পাবার কথা।"

রচনাবলীর ২২ সংখ্যক পত্রটি ৩রা জানুয়ারি ১৯২৭ তারিখে শচীনকরকে লেখা। এ পত্রটি উল্লেখযোগ্য ও সুলিখিত পত্র। আমরা এর আগে উল্লেখ করেছি ১৯২৭-এর ২রা জানুয়ারি লেখা এক পত্রে (মুরলীধরকে লেখা) নজরুল হতাশার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু ঠিকতার পরের দিন লেখা এ পত্রে কবি যেন আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পেয়েছেন। তিনি কবি বলে গৌরব বোধ করছেন। তাই তিনি এ চিঠিতে বলেছেন—

> পণ্ডিত জমায়, সে কৃপণ ; কবি বিলোয় সে দাতা, কবি নেয়, কিন্তু সে দান্ করে,—নদীর মত সে চলে গাইতে গাইতে, দান করে দু'পাশে ফুল ফুটিয়ে।

আলোচ্য পত্রের ভাষা কবির অজ্ঞাতেই যেন পত্রসাহিত্য হয়ে উঠেছে। পত্রের অন্যত্র তিনি লিখছেন —

> ফুলের ভাষা, কুঁড়ির ব্যথা, পাতার কথা, লতার আবেগ, তরুর বাণী আমরা শুনতে পাই, বুঝতে পারি বলে আচার্য জগদীশের ল্যাবরেটরী দেখতে যাইনে। তরুলতাকে মেরে ছুঁচ ফুটিয়ে তার হাসি-কান্না দেখার প্রবৃত্তি আমার নেই।

নজরুল চিঠির শেষে লিখেছেন, "কদিন বেশ কাটল আবার প্রবেশ করব, কাব্যলক্ষ্মীর হারেমখানায়।" নজরুল সাহিত্যে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের এটি একটি সুন্দর উদারহরণ।

১৯২৬ সালের জুন মাসে নজরুল ইসলাম প্রথম বারের মত ঢাকায় আসেন। তিনি ঢাকায় এসে ঢাকার কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের একটি বৈঠকেও অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি মুসলমি সাহিত্য সমাজের অনুষ্ঠেয় প্রথম বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করার জন্য সাহিত্য সমাজের সম্পাদক আবুল হুসেন কবিকে আমন্ত্রণ জানান। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নজরুল ১০ই ফেব্রয়ারি ১৯২৭ তারিখে আবুল হুসেনকে এক পত্র (রচনাবলীর ২৫ সংখ্যক) দেন।

লক্ষ্য করা গেছে সাহিত্য সমাজের নামের সঙ্গে মুসলিম শব্দটি দেখে অথবা এ সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত না হওয়ার কারণে নজরুলের মনে কিছু সংশয় দেখা দিয়েছিল।

> কোন আনন্দ-মানিক আপনাদের উৎসবের মালার মধ্যমণি, কোন্ বেদনা সুন্দর এর দেবতা, কোন্ প্রকাশোন্মুখ অন্তরে এর পূজাবেদী এর আভাস না পেলে অমি কি করে আগমনী গান রচনা করি? যদি আমাকেই গাইতে হয় এ আনন্দ জলসার আগমনী, তাহলে আপনাদের উৎসবের অন্তরের কথা যাকে কেন্দ্র করে সুরলক্ষ্মীর নৃত্য চলবে শিগগির জানাবেন।

কবি বেদনার মধ্যে সুন্দরকে দেখেছেন এবং সে বেদনা-সুন্দরের সাধনা তিনি করেছেন তাঁর সমগ্র জীবনে। কবি তাঁর 'আমার সুন্দর' এবং অন্যান্য প্রবন্ধ বা অভিভাষণে যে সুন্দরের কথা বলেছেন তার ইঙ্গিত আলোচ্য চিঠিতেও লক্ষ করা যায়।

> আমার বাণী শিল্পীর বাণী নয়, আমার বাণী বেদনাতুরের কান্না। আমার

> সুরলক্ষ্মী স্বর্গের উর্বশী নয়, মর্ত্যের শকুন্তলা-বিরহ শীর্ণা, অশ্রুমুখী পরিত্যক্তা শকুন্তলা, উৎপীড়িতা লায়লি।

প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়কে লেখা পত্রটি (রচনাবলীর ২৮ সংখ্যক) ১৯২৭-এর ৪ঠা জুলাই লেখা। এ পত্রটি সাহিত্য সমালোচনামূলক। এ পত্রে নজরুল ইসলাম মন্মথ রায় রচিত বিভিন্ন নাটকের প্রশংসা ও সমালোচনা করেছেন। এ নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন (১৯২৪-২৬) রচিত মুক্তির ডাক' এবং পরবর্তীকালে লেখা 'আজগর মণি', 'কাজললেখা, 'সেমিরিমিস', 'ইলা', 'স্মৃতিছায়া', 'ছাপা' ইত্যাদি। 'সেমিরিমিস' নাটক সম্পর্কে নজরুল এ পত্রে লিখছেন—

> সেমিরিমিস' পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি তা বলে উঠতে পারছিনে। ... এত বড় সৃষ্টি! — দুঃসাহসের দিক থেকে বলিছনে—এর সৃষ্টির সার্থকতার ও পরিপূর্ণতার দিক দিয়েই বলছি—আমায় আর কারুর কোন লেখা এত বিচলিত করে নি।

ঢাকায় মন্মথ রায়ের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎ ঘটেছিল কিনা তা জানা যায়নি। তবে জগন্নাথ হল বার্ষিকী 'বাসন্তিকায়' প্রকাশিত মন্মথ রায়ের নাটকগুলো নজরুল পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে এদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। আইনজীবী হওয়া সত্ত্বেও মন্মথ রায় নাট্যকার হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হন। তার রচিত 'মহুয়া', 'করাগার' প্রভৃতি নাটকে নজরুল রচিত গান সংযোজিত হয়।

নজরুল সময় পেলে সমকালের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত অন্যান্য লেখকের রচনা যে পড়তেন তার পরিচয় এ পত্রে রয়েছে। নাজিরুল ইসলামের একটি রচনা 'নওরোজ' পত্রিকায় পাঠ করে তিনি লিখেছিলেন — "নওরোজ' বেরিয়েছে ওতে আমার এক মিতে লেখককে দেখবেন, তবে তিনি 'নাজিরুল' নজরুল নন -আকার ইকারের দণ্ডধারণ করে নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করেছেন। তাঁর ভাল লেখা পড়ে, তাঁর প্রাপ্য নজরুলকে দেবেন না যেন।"

রচনাবলীর ত্রিশ সংখ্যক পত্রটি প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর কাছে লেখা একটি সুদীর্ঘ পত্র। এই দীর্ঘ পত্রে নজরুল তাঁর সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা কবির মানস বিচারে বিশেষ সহায়ক। পত্রটি সুপ্রচলিত বলে তার আর এখানে উদ্ধৃতি দিচ্ছি না। নজরুলের পত্রসাহিত্য সংখ্যায় কম হলেও এটি সাহিত্যপদবাচ্য একটি সুন্দর চিঠি। গদ্যের উপর নজরুলের যে আশ্চর্য অধিকার ছিল তার পরিচয় এ পত্রে

সুস্পষ্ট। এ পত্রে নজরুল ইব্রাহীম খাঁর সদ্য প্রকাশিত 'কামাল পাশা' (১৩৩৪) নাটক সম্পর্কেও মন্তব্য করতে গিয়ে সমকালীন মুসলিম সাহিত্যেরও একটি মূল্যায়ন তুলে ধরেন।

> কামাল পাশা'র দরকার আছে জানি ; কিন্তু তার চেয়েও দরকার— আমাদের চোখের সামনে আমাদেরই জীবনের এই ট্রাজেডি তুলে ধরা। কবিতা ও প্রবন্ধ লেখকের আমাদের অভাব নেই। নাটক লিখিয়ের অভাবও আপনাকে দিয়ে পূরণ হতে পারে। আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব কথা-সাহিত্যিকের। এর তো কোনো আশা-ভরসাও দেখছিনে কারুর মধ্যে। অথচ কথাসাহিত্য ছাড়া শুধু কাব্যের মধ্যে আমাদের জীবন, আমাদের আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে কেউ পারবেন না। অনুবাদকের দিক দিয়েও আমরা সবচেয়ে পিছনে। সঙ্গীত, চিত্রকলা, অভিনয়, ইত্যাদি ফাইন আর্টের কথা না-ই- বললাম।

আমরা জানি মুসলিম সমাজের আমন্ত্রণে নজরুল ঢাকায় আসেন এবং এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। ঢাকায় নজরুলের এই অবস্থান তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে এবং এ অধ্যায়ের সঙ্গে কাজী মোতাহার হোসেনও অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন। তাই ঢাকা থেকে ফিরে আসার পর নজরুল মোতাহার হোসেনকে অনেক চিঠি লেখেন। নজরুলের চিঠিপত্রের সঙ্কলনে, সর্বাধিক চিঠি লেখা হয়েছে কাজী মোতাহার হোসেনকে —আটটি পত্র (৩১-৩৫ এবং ৩৭-৩৯ সংখ্যক)। মোতাহার হোসেনকে লেখা প্রথম পত্রের সম্বোধন -'প্রিয় মোতাহার' (২৪-২-১৯২৮)। দ্বিতীয় পত্রে সম্বোধনে রূপান্তর 'বন্ধু' (২৫-২-১৯২৮)। তৃতীয় পত্র থেকে শুরু করে সব পত্রে নতুন সম্বোধন লক্ষ্য করা যায়। 'প্রিয় মোতিহার'। তৃতীয় পত্রের শুরুতেই নজরুল লিখেছেন,— "তোমায় এবার থেকে মোতিহার বলে ডাকব।"

মোতাহার হোসেনকে লেখা এ পত্রগুলোর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা লক্ষ করে থাকবেন, পত্রের অধিকাংশ কথা রূপকাশ্রিত। যাঁকে কেন্দ্র করে নজরুলের জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা, সেই ফজিলাতুন্নেসাকে লেখা একটি পত্র এই পত্রাবলিতে স্থান পেয়েছে। সম্বোধন ও তারিখ বিহীন এই পত্রে শুধু সময় লেখা হয়েছে— 'শনিবার রাত্রি ১২টা।' এ যেন একটি বিশেষ পরিস্থিতি ও পরিবেশের পরিচায়ক।

ফজিলাতুন্নেসাকে লেখা (রচনাবলী ৩৬ সংখ্যক) পত্রে কোন সম্বোধন নেই, কিন্তু শুরুতে রয়েছে 'ঈদ মোবারক'। এ পত্রটি আবিষ্কৃত হওয়ায় আমরা একটি অপরিজ্ঞাত

তথ্য জানতে পারি। তা হচ্ছে নজরুল তাঁর 'সঞ্চিতা' গ্রন্থটি ফজিলাতুন্নেসার নামে উৎসর্গ করার প্রস্তাব করেছিলেন। সেই সঙ্গে নজরুলের অনুরোধ –"সুদূর ভক্ত কবির এই একটি নমস্কারকে প্রত্যাখ্যান করিয়া পীড়া দিবেন না—এই আমার আকুল প্রার্থনা।" সম্ভবত সেই প্রার্থনা অনুমোদিত হয়নি।

রচনাবলীর ৪০ সংখ্যক পত্রটি আবদুল কাদিরকে ২-১-২৯ তারিখে লেখা। এটি এবং আরো দু'টি পত্রসহ 'পত্রাবলী শিরোনামে 'দিলরুবা' পত্রিকায় জ্যেষ্ঠ ১৩৩১ সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়েছে। 'দিলরুবা'য় প্রকাশিত এ পত্রে আবদুল কাদিরের ব্যক্তিগত জীবনের সফলতা-ব্যর্থতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল, যা রচনাবলী সম্পাদনাকালে সম্পাদক আবদুল কাদির বাদ দিয়েছেন। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রে 'পুনঃ' অংশে অতিরিক্ত কিছু কথা ছিল—

কংগ্রেসে আসনি, ভালই করেছ।

পেয়েছ চৌত্রিশ ঘোড়ার ডিম ! দেখা যাক

স্বরাজের কেমন বাচ্চা বেরোয় !

সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে নজরুলের এই উক্তি রচনাবলীতে পরিবর্জিত।

লক্ষণীয় বিষয়, নজরুল রচনাবলীতে আলোচ্য পত্রের যে অংশগুলো পরিবর্জিত হয়েছে সে অংশগুলো আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনাসম্ভার' (১৯৬৯) গ্রন্থের চিঠিপত্র অংশে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবদুল কাদিরের কাছে লেখাপত্রে নজরুল তাঁর এক বোধোদয়ের উল্লেখ করেন—"এতদিন আমার পাবলিশাররাই আমায় ঠকিয়ে এসেছে। আমার বোধোদয় হয়েছে, তাই মনে করেছি—এবার তার শোধ নেব। এবার থেকে বইগুলো নিজেই প্রকাশ করব।" প্রসঙ্গত তিনি জানান, 'চক্রবাক' নাম দিয়ে একখানা কবিতার বই তিনি ছাপাতে দিয়েছেন এবং তারই বিজ্ঞাপন তৈরি করে পাঁচখানা পত্রিকায় ছাপানোর জন্য আবদুল কাদিরকে পাঠিয়ে দেন। বিনিময়ে তিনি সেসব পত্রিকায় কবিতা দিয়ে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু আমরা জানি 'চক্রবাক' গ্রন্থটি ১২ই আগস্ট ১৯২৯ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং এ গ্রন্থে প্রকাশক হিসেবে ডি. এম লাইব্রেরীর গোপালদাস মজুমদারের নাম রয়েছে। কোন কোন পুস্তকে অবশ্য প্রকাশক হিসেবে নজরুলের নাম আমরা দেখেছি যেমন 'বিষের বাঁশী'।

আবদুল কাদিরের কাছে প্রেরিত পত্রে কবি হিসেবে নজরুলের আত্মবিশ্লেষণ ও

মূল্যায়নের পরিচয় পাওয়া যায়।

> তুমি আজকের মানুষকে খুশি করতে গিয়ে কালকের অনাগতদের অসম্মান অর্জন করো না যেন! ঐ রোগে আমার যে সর্বনাশ করেছে ; তার ক্ষতিপূরণ বুঝি সারা জীবনেও হবেনা। বহুদিন আনন্দলোকের দ্বারে বসে কনসার্টই বাজিয়েছি হাতের বাঁশি ফেলে। তাতে বুকের ব্যথা বেড়েছে বই কমেনি. আজ সেই ব্যথার কথাই যখন সুরের সুতোয় গাঁথলাম, তখন ব্যথাও যেমন কমেছে, ক্ষতটাও তেমনি মালায় ঢাকা পড়েছে। আমার চোখের জলে সকলের চোখের জল এসে মিশেছে, আমার বেদনা-লোক তীর্থ-লোকে পরিণত হয়েছে।

কবি আজিজুল হাকিমকে লেখা ৫-১০-২৯ তারিখের (রচনাবলীর ৪২সংখ্যক) পত্রটিও 'দিলরুবা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠির শুরুতেই যথাসময়ে পত্র লিখতে না পারার কৈফিয়ত হিসেবে তিনি একটি সুন্দর বাক্য প্রয়োগ করেছেন—

> সময়ের অভাব বলেই [চিঠির উত্তর] দিতে পারিনে—পলিটিক্স, কাব্য, গান, আড্ডা ইত্যাদির চাপে আমার ভদ্রতার ভদ্রবধু বহুদিন হল ঘোমটা টেনে ঘরের কোন নিয়েছে।

নজরুল সমকালীন লেখকের, বিশেষ করে তরুণদের লেখা যে আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন তার পরিচয় আমরা বেশ কয়েকটি চিঠিতে পেয়েছি। প্রয়োজন বোধে তিনি তরুণ লেখকদের রচনার সমালোচনা করতেন এবং তাদের উৎসাহের বাণী শোনাতেন। আলোচ্য পত্রে রয়েছে—

> 'তামার কবিতা দু'একটা খুবই ভাল লেগেছে। ছন্দ ও ভাষা দুই ঘোড়াকেই তুমি বেশ আয়ত্ত করেছ। ভাবের নীহারিকা লোক তোমার উজ্জ্বল গ্রহ হয়ে দেখা দেয়নি বলে অধৈর্য হয়ো না। ও দানা বাঁধতে একটু সময় লাগবে হয়তো।

'দিলরুবা' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ সংখ্যায় নজরুলের ৩টি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। আবদুল কাদির এবং আজিজুল হাকিমকে লেখা পত্র দুটি রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে। তৃতীয় পত্রটি 'ইজাবউদ্দীন আহমদ সাহেবের সৌজন্যে' প্রাপ্ত। পত্রের তারিখ ১৯৩৪, ২১শে ডিসেম্বর। পত্রটির পূর্ণ পাঠ রচনাবলীতে (৬০ সংখ্যক) রয়েছে। এটি কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীর উদ্দেশ্যে লেখা। এ পত্রে আল্লাহর অদ্বৈতবাদের কথা সুন্দর সুললিত ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। পত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

আরবি ফারসি শব্দবহুল ভাষা। এরকম বিষয়ানুগ আরবি ফারসি শব্দ বহুল আরেকটি পত্র রচনাবলীতে সংকলিত (৫৩ সংখ্যক)। এ পত্রটি মক্তবের জন্য কবির রচিত পাঠ্যগ্রন্থ 'মক্তবসাহিত্য' অনুমোদনের পর মক্তব-মাদ্রাসায় তা পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার আবেদনপত্র।

এর শুরু– 'বাঙলা মাদ্রাসা ও মক্তবের মৌলভী সাহেবানের খেদমতে আরজ : আসসালামো আলায়কুম।' শেষ স্বাক্ষর 'খাদেম নজরুল ইসলাম'। এ চিঠির লেখক যেন রঙীন উত্তরীয় পরা নজরুল নন, ইনি যেন আচকান-চাপকান টুপি পরিহিত নজরুল। এখানে নজরুল কওমের একজন খাদেম। তাই চিঠিতে দেখছি —

> কওমের খাদেম এই বান্দার নাম হয়ত আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। আমি আমার কবিতায়, ইসলামী গানে গল্পে উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে বক্তৃতায় আশৈশব ইসলামের সেবা করিয়া আসিতেছি। আমারি বহু চেষ্টায় আজ ইসলামী গান রেকর্ড হইয়া ঘুমন্ত আত্মভোলা মুসলিম জাতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। আরবি ফারসি শব্দের প্রচলন বাঙলা সাহিত্যে আজ বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে—তাহাও এই বান্দারই চেষ্টায়। আমি কওমের নিকট হইতে হাত পাতিয়া কখনো কিছু চাহি নাই ইহার বদলাতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটি পত্র এ সংকলেন সঙ্কলিত হয়েছে (রচনাবলীর ৪৮ সংখ্যক)। সে পত্রের সম্বোধন 'শ্রীচরণারবিন্দেষু।' এই বিশিষ্ট সমাসবদ্ধ পদে নজরুল আরও দু'জনকে সম্বোধন করেছেন। একজন হচ্ছেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক (রচনাবলীর ৫২ ও ৫৪ সংখ্যক) ও অপরজন বরদাচরণ মজুমদার (রচনাবলীর ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ সংখ্যক)। কবি যখন মাথরুন স্কুলের ছাত্র, তখন সে স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। যোগী ঋষি নামে খ্যাত বরদাচরণ মজুমদারের ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন নজরুল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা ২৮-৮-১৯৩৪ পত্রের শুরু এভাবে

> গুরুদেব ! বহুদিন ! বহুদিন শ্রীচরণ দর্শন করিনি। আমার ওপর হয়ত প্রসন্ন কাব্যলক্ষ্মী হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরের ভয়ে আমায় ত্যাগ করেছেন বহুদিন। কাজেই সাহিত্যের আসর থেকে আমি প্রায় স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছি। আপনার তপস্যায় আমি কখনো উৎপাত করেছি বলে মনে পড়ে না, তাই অবকাশ সত্ত্বেও আমি আপনার দূরে দূরেই থেকেছি। তবু জানি, আমার শ্রদ্ধার শতদল আপনার চরণস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

বিষয়ভেদে যেমন গদ্যের ভাষার রূপান্তর ঘটে, তেমনি পত্র ভেদেও ভাষার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫-এর ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে নজরুলকে এ-চিঠির উত্তর পাঠিয়েছিলেন (ভূঁইয়া ১৯৮৫ : ৭০)। অনেকের অনুমান নজরুল ঐ চিঠিতে একান্ত অভিভূত হয়ে 'তীর্থপথিক' নামে একটি কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তর দেন। (রফিকুল ১৯৭২ : ৫৪৬)

আমরা ইতঃপূর্বে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে আনন্দের সঙ্গে নজরুল যোগদানে যে সম্মতি জানিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করেছি। লক্ষ্য করা যায়, মুসলিম তরুণ সমাজের অথবা মুসলিম কোন সংগঠনের পক্ষ থেকে কোন আমন্ত্রণ লিপি পেলে নজরুল তা সাদরে গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠেয় বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের আমন্ত্রণ পত্র, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসবের 'সঙ্গীত জলসায় অধিনায়কত্ব' করার আমন্ত্রণ পত্র এবং কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে 'সাদর দাওয়াত' এর উল্লেখ করা যায়। কবির সম্মতি পত্রগুলি এ রচনাবলীর চিঠিপত্রে সংকলিত হয়েছে। কোন কোন পত্রে তিনি তরুণ মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যেও কিছু উপদেশ প্রদান করেছেন (রচনাবলীর ৪৪ ও ৪৫ সংখ্যক পত্র)।

রচনাবলীর ৪৭ সংখ্যক পত্রটি নজরুলের লেখা একটি ইংরেজি পত্রের বঙ্গানুবাদ। ২৭শে আগস্ট, ১৯০৫ তারিখে নজরুল তাঁর চাচা কাজী কায়েম হোসেনকে ইংরেজিতে একটি পত্র লিখেছিলেন। খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন কৃত বঙ্গানুবাদ রচনাবলীর চিঠিপত্রে সংযোজিত হয়েছে। এ চিঠির ভাষা নজরুলের না হলেও চিঠির বক্তব্য একান্তই নজরুলের। এ চিঠিতে তিনি তাঁর চাচাকে তাঁর ভাইদের অভাব-অসুবিধার কথা জানিয়ে সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করেছেন। চিঠিটি নজরুলের ভ্রাতৃবাৎসল্যের সাক্ষ্যবহ।

নজরুলের সবগুলি চিঠিরই আলোচনা বা উল্লেখ না করলেও আমরা অধিকাংশ চিঠিরই পরিচিতি এখানে তুলে ধরেছি। নজরুলের চিঠিপত্র পর্যালোচনা করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করেছি ঃ

১. চাচা কাজী কায়েম হোসেনকে লেখা ইংরেজিপত্র বাদ দিলে কোন পত্রই তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে লেখা নয়। হয় এ ব্যাপারে তিনি উদাসীন ছিলেন অথবা সে চিঠিগুলি উদ্ধার প্রাপ্ত হয়নি।

২. নজরুল যাঁর কাছে চিঠি লিখেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পত্রিকার সম্পাদক, গ্রন্থ প্রকাশক, বন্ধু বা সুহৃদ, সহপাঠী বা বাল্যবন্ধু, কবির গুণগ্রাহী তরুণ যুবক এবং কোন না কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের কর্মকর্তা।

৩. সৌজন্যমূলক দুই একটি পত্র বাদ দিলে অধিকাংশ পত্রেই নজরুল আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ। সৌজন্যমূলক পত্রে লক্ষ্য করা যায় তিনি সহজে বা সানন্দে সভা-সমিতিতে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন অথবা অন্যকে অনুগৃহীত করে আনন্দিত হতেন।

৪. ব্যক্তিগত পত্রসমূহে আমরা নজরুলের জীবনের দুঃখজনক একটি চিত্র পাই। তিনি প্রায় সারা জীবনই আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। অকপটে তিনি আর্থিক অভাব-অনটনের কথা জানিয়ে অর্থ সাহায্য যাঞ্চা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তা প্রাপ্য সম্মানী অথবা কখনও বা ব্যক্তিগত ঋণ। প্রকাশকেরা নজরুলের প্রাপ্য টাকা দিতে যে গড়িমসি করতেন তাও আমাদের অজানা থাকেনি।

৫. উপদেশমূলক কিছু চিঠিতে তরুণ সম্প্রদায় অথবা মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যে বাণী দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর বাণী আপ্তবাক্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

৬. নজরুল সমকালীন গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদি পাঠ করতেন। প্রয়োজনবোধে তিনি উদীয়মান সাহিত্যিকদের রচনার মূল্যায়ন করে তাঁদের উৎসাহ প্রদান করতেন।

৭. নজরুল তাঁর বাজেয়াপ্তকৃত বইসহ অন্যান্য গ্রন্থের প্রচার ও বিপননে নিজেই উদ্যোগী হয়েছিলেন।

৮. নজরুল তাঁর ফটো বা আলোকচিত্র তোলার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত প্রায় গ্রন্থেই নজরুলের আলোকচিত্র সংযোজিত হয়েছে। প্রকাশকদের আগ্রহ এবং নজরুলের সমর্থনেই তা হয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

৯. নজরুলের চিঠিপত্রে তাঁর নিজস্ব গদ্যভঙ্গি সুস্পষ্ট। অনুপ্রাস, উপমা ও যমকের সুকৌশল প্রয়োগ ছাড়াও নজরুলের কৌতুকপ্রিয়তা ও উল্লাস-প্রাচুর্য্য দুর্লক্ষ্য নয়।

গ্রন্থপঞ্জি

কাদির আবদুল

১৯৬৯ *নজরুল রচনা-সম্ভার,* ঢাকা।

১৯৮৪ *নজরুল রচনাবলী, ১ম-৪র্থ খণ্ড,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ভূঁইয়া ইকবাল

১৯৮৫ *রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুজফ্‌ফর আহমদ

১৯৬৯ *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা,* ৩য় মুদ্রণ, কলিকাতা

রফিকুল ইসলাম

১৯৭২ *নজরুল জীবনী,* ঢাকা

১৯৯৭ *কাজী নজরুল ইসলাম-জীবন ও সৃষ্টি,* কলিকাতা

সেলিনা বাহার জামান

১৯৯৪ (সম্পা.) নজরুলের পাণ্ডুলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

মাহফুজুর রহমান

১৯৬৫ 'নজরুলের একটি চিঠি', *বাঙ্‌লা একাডেমী পত্রিকা,* কার্তিক-পৌষ, ১৩৭২

১৯৭০ 'কুড়িগ্রাম নজরুল', *নজরুল একাডেমী পত্রিকা,* বর্ষা-১৩৭৭